

সারসংক্ষেপ

বিশ শতকীয় বাংলা সাহিত্যধারায় নানা বৈচিত্র্যের আগমন ঘটেছিল। রাজনৈতিক এবং সামাজিক এক দোলাচলময় পরিস্থিতিতে বাঙালি সাহিত্যিকেরা তাঁদের লেখার উপকরণ হিসেবে কখনো বেছে নিয়েছিলেন উচ্চবিত্তের নৈতিকতা, কখনো মধ্যবিত্তের দোলাচলতা, আবার কখনো নিম্নবিত্তের জীবনসংগ্রাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালের অস্তিত্ব সংকট, মন্বন্তর, উদ্বাস্তু সমস্যা থেকে শুরু করে সেই বিধ্বস্ত জীবনে প্রেম, স্নেহ, সম্পর্কের বিবর্তন সবই স্থান পেয়েছিল সাহিত্যে। কমলকুমার মজুমদারের বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব সেই বৈচিত্র্যের অংশ হয়েই। রবীন্দ্র যুগের একেবারে শেষের দিকে বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব এবং খানিকটা রবীন্দ্র বিরোধী হয়েই। খানিকটা রবীন্দ্র বিরোধী বলার কারণ, তিনি রবীন্দ্রিয় ভাবধারা বা ভাষারীতিকে পাশ কাটিয়ে যেমন নিজস্ব একটি জগত গড়ে তুলেছিলেন, তেমনি কখনো কখনো রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কিছুক্ষেত্রে সহমতও পোষণ করেছিলেন। ফলে কমলকুমারের কথাসাহিত্যে নানা গুণে তৎকালীন কথাসাহিত্যিকদের থেকে আলাদা হয়ে উঠেছিল।

একেবারে প্রথমেই তাঁর লেখা বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে যে বৈচিত্র্যটি চোখে পড়ে, তা তাঁর ভাষার অনন্যতা। তিনি সাহিত্য সৃষ্টির জন্য একেবারে ভিন্ন ধারার ভাষা ব্যবহার করেছিলেন, যে ভাষা রবীন্দ্রিক সাহিত্য ভাষা থেকে আলাদা। রবীন্দ্র পরবর্তী যুগে সাহিত্যের ভাষাও হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্র অনুসারী। কিন্তু কমলকুমার সেই ভাষা পদ্ধতিকে অনুসরণ করলেন না। একটি নতুন ভাষা তৈরি হল কমলকুমারীয় কথাসাহিত্যের জন্য, যা পূর্ণতা পেয়েছিল ‘অন্তর্জলী যাত্রা’ উপন্যাসে। সেই ভাষায় মিশে ছিল বঙ্কিমী ভাষারীতি, মিশনারি ভাষার বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর নিজস্ব সাহিত্য ভাষা।

তিনি প্রথম জীবনে তাঁর সাহিত্যের বিষয় হিসেবে বিভিন্ন বিষয়কে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলেন। কখনো প্রেম, কখনো রাজনীতি বা রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মানবজীবনে তাঁর রচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। নারী-পুরুষ সম্পর্ক, বিশেষ করে নারী চরিত্রের নানা রূপকে ধরার চেষ্টা তিনি করেছিলেন তাঁর কথাসাহিত্যে। তবে এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে বিষয়ভিত্তিক

কাহিনি নির্মাণে তিনি প্রবৃত্ত হয়েছিলেন গল্প লেখার সময়। কারণ তাঁর উপন্যাসগুলি মূলত থিম নির্ভর, সেখানে ঘটনার প্রবহমানতা লক্ষ করা যায় না। পর পর বেশকিছু ছবি ফুটে ওঠে সেই সব উপন্যাসে। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হল ‘অনিলা স্মরণে’ এবং ‘শবরীমঙ্গল’ নামক উপন্যাস দুটি। যদিও ‘শবরীমঙ্গল’ নিয়ে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়। কমলকুমারের মৃত্যুর পর প্রকাশিত এই উপন্যাসটিকে কমলকুমারের শেষ জীবনের লেখা বলা হলেও, লেখক-পত্নী দয়াময়ী মজুমদারের মতানুসারে এবং লেখাটির বৈশিষ্ট্য, বাক্যের গঠন, কাহিনি পারস্পর্য দেখে তা কমলকুমারের প্রথম জীবনের লেখাই মনে হয়। তাছাড়া উপন্যাসটি প্রকাশকালে কমলকুমারের স্ত্রী দয়াময়ী মজুমদার ভূমিকায় লেখেন—

“লেখকের প্রয়াণের পর ‘শবরীমঙ্গল’ উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি যখন আমার হাতে ফিরে আসে তখন লেখাটির অর্দ্ধাংশ মাত্র পাই। শবরীমঙ্গল একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস ছিল, অপ্রাপ্ত অংশগুলি বাদ হয়ে যাওয়ার ফলে এর ভাবধারাকে বজায় রেখে প্রকাশ করার পক্ষে অসুবিধে দেখা দেয়। তবুও লেখার আপাতত বিন্যাসকে লক্ষ্য রেখেই সামান্য সংযোজনার কাজ আবশ্যিক হয়।”

কিন্তু ঠিক কোন কোন অংশে সংযোজনা করা হয়েছিল তা জানা যায় না। ফলে এই উপন্যাসটিতে কমলকুমারীয় বাক্য-গঠন রীতি বা ভাষার বৈশিষ্ট্য কতখানি অক্ষুণ্ণ রয়েছে, তা একটি প্রশ্ন চিহ্নের সম্মুখীন করে আমাদের। তবে যদি অন্যান্য উপন্যাসগুলিকে সামনে রেখে বিবেচনা করি তাহলে দেখতে পাব যে এই উপন্যাস দুটিই (‘অনিলা স্মরণে’ এবং ‘শবরীমঙ্গল’) তুলনামূলকভাবে কাহিনিনির্ভর উপন্যাস।

গল্পের ক্ষেত্রেও আমরা এই কাহিনিনির্ভরতা লক্ষ করেছিলাম। প্রতিটি গল্পে কমলকুমার নিজেকে একটি পরীক্ষার মুখোমুখি করতেন, আর তাই তাঁর গল্পে অগুনতি বিষয়বৈচিত্র্য দেখা যায়। তিনি প্রেমকে নানা সময় নানা ভাবে দেখেছেন। একেবারে লেখালিখি জীবনের শুরুতে ‘লাল জুতো’ গল্পে যে প্রেম পিতৃহ্বের প্রতীক বা ভালোবাসার প্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছিল, জীবনের শেষ পরিসরে উপনীত হয়ে ‘আমোদ বোষ্টুমি’ গল্পে তাঁর পরিণতি ঘটলো প্রতিহিংসায়।

কখনো সামাজিক অবস্থানকে তিনি এনেছেন প্রেম সম্পর্কের মধ্যে আবার প্রেম যে শুধু নারী-পুরুষ সম্পর্কের প্রতীক— সেই চিরাচরিত ধারনার বাইরে গিয়ে তিনি তাকে দেখেছিলেন সমকামিতার আলোকে।

একইভাবে নারী-পুরুষ সম্পর্কের ক্ষেত্রেও কমলকুমার নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিয়ে গেছেন তাঁর চরিত্রদের। তাঁর গল্পে তারা শুধু স্বামী-স্ত্রী বা প্রেমিক-প্রেমিকা সম্পর্কে আবদ্ধ নয়। সেখানে প্রেমের সঙ্গে স্থান করে নেয় যৌন চাহিদা, শারীরিক প্রবৃত্তি এবং মানসিক অপ্রাপ্তিও। তবে যৌন চাহিদা বা শারীরিক আকর্ষণের ক্ষেত্রেও তিনি পুরুষ এবং নারী উভয়ের কথাই বলেছেন জোর গলায়। বাস্তবিক জীবনে গোঁড়া কমলকুমার মজুমদারকে সাহিত্যের পাতায় বেশ অনেকটাই স্বাধীন চিন্তাধারার মানুষ বলে মনে হয়। তাই তিনি নারীর সমকাম নিয়ে অনায়াসে কথা বলেন পঞ্চাশের দশকে দাঁড়িয়ে, নারী শুধুই মাতৃমূর্তি হয়েই রয়ে যায় না তাঁর গল্পে, হয়ে ওঠে ‘নিম্ন অল্পপূর্ণা’। তুলনামূলকভাবে কমলকুমারের গল্পে পুরুষ চরিত্রের বৈচিত্র্য কম। উপন্যাসগুলি পুরুষ প্রধান হলেও তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ততটা বিবর্তন লক্ষিত হয় না, যতটা নারী চরিত্রের ক্ষেত্রে হয়েছিল। গল্পের ক্ষেত্রে পুরুষ চরিত্ররা বেশ নিম্প্রভ।

তবে কমলকুমার ছাপ রেখে যান তাঁর লেখায় অন্ত্যজ এবং প্রান্তিক শ্রেণির মানুষদের জীবনচিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে। নানা পরিস্থিতিতে তিনি দেখিয়েছিলেন সামাজিক অবস্থান কীভাবে ক্ষত-বিক্ষত করে তোলে মানুষের জীবনযাপন। কখনো প্রান্তিক চাষির জীবনের সংকটকে তিনি উপস্থাপন করেছেন জমিদার সম্প্রদায়ের অনাচারকে নির্দিষ্ট করতে আবার কখনো একটি ডোম বালকের মধ্য দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে উচ্চবিত্ত তথা এলিট শ্রেণির মানুষের জন্য বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে তাদের কৌম সংস্কৃতি। কমলকুমার তাদের জীবনের crisis-এর মধ্য দিয়ে দয়া বা সহমর্মিতা তৈরি করতে চাননি পাঠক মননে। তিনি সেই সমাজের একজন হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন সাহিত্যের মধ্য দিয়ে, উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন তাঁদের জীবনের অনুভূতিগুলি। তাদের জীবনকে কল্পনার রঙে জারিত করে এলিট সমাজ তাতে শুধুই আর্ট খুঁজে ফেরে, কিন্তু বাস্তবিক তাদের জীবনে সেই আর্টের লেশমাত্র নেই। এলিট শ্রেণির এই অযাচিত অনুপ্রবেশ বরং তাদের সমাজ, সংস্কৃতি, জীবনযাপনকে দূষিত করে তোলে। তারা

হারিয়ে ফেলতে শুরু করে নিজস্বতা, ক্রমে সেই ‘রঙ্গিলা চাঞ্জার’দের পছন্দসই হয়ে উঠতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলে।

কমলকুমার মজুমদার তাঁর গল্পে বারবার বলেছিলেন তাঁদের কথা, যাদের জীবন বিংশ শতকের তিন বা চারের দশকে সেভাবে সাহিত্যের বিষয় হয়ে ওঠেনি। মহাশ্বেতা দেবীর আগে কমলকুমার মজুমদারই বাংলা সাহিত্য জগতের একজন লেখক যিনি সাঁওতাল, ডোম, শবর প্রভৃতি শ্রেণির মানুষদের কথাসাহিত্যের মুখ্য চরিত্র করে তুললেন। তাদের জীবনকে কেন্দ্র করে, তাদের যাপনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হল কাহিনি।

এইভাবে কমলকুমার মজুমদারের কথাসাহিত্যে মানবজীবনের নানাদিক আলোচনার মাধ্যমে আমাদের অভিসন্দর্ভটি অগ্রসর হয়েছে। সেখানে তাঁর বর্ণিত নারী চরিত্রের বিবর্তন, সমাজে নারী-পুরুষ সম্পর্কের নানাদিক; সমাজ, সংস্কৃতি, অবস্থান, লিঙ্গ, মানসিকতাকে কেন্দ্র করে মানবজীবনে তৈরি হওয়া দ্বন্দ্বময়তা এবং অন্ত্যজ ও প্রান্তিক শ্রেণির মানুষের জীবনযাপনের যে আখ্যান কমলকুমার রচনা করেছেন, তাঁর লেখায় ভাষাগত স্বাতন্ত্র্যের বাইরে গিয়ে সেটাই আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।